সংবাদ 16

তারিখ ... 2 0 AUG 1996
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম ৫

স্বনির্ভরতা ও সাক্ষরতার সম্পর্ক

সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া

রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি যেমন অবিচ্ছেদ্য, ঠিক তেমনি স্বনির্ভরতার সাথে সাক্ষরতার প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন মানুষই আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত নিম্নতম জীবনমানেরও অনেক নিচে অবস্থান করে। এই স্তরে অবস্থানকারীদের কাছে উন্নতর প্রযুক্তি, পরিবার পরিকল্পনা, সাক্ষরতা ইত্যাদির আবেদন এবং কর্মকান্ড সীমিত হতে বাধ্য। জনগণকে এই অর্থনৈতিক অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা না গেলে তাদেরকে সত্যিকার অর্থে সাক্ষর করে তোলা দুরূহ– একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে সাক্ষরতা ও জ্ঞানের আলো দিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই উদ্যোগ সৃষ্টি করতে না পারলে, ওপর থেকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়া রীতিমতদুঃসাধ্য।

বিগত ৬ই আগস্ট ১৯৯৬ ইং তারিখে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন "শিক্ষাই হবে আমাদের জাতি গঠনের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার।" তার বিস্তারিত বিবরণ এবং কর্মপদ্ধতি সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পরই কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা "এনজিও" উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় এদেশের দুস্থ মানুষের সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে সচেতনতা এবং স্বাবলম্বী বা স্বনির্ভর হয়ে উঠার সুযোগ। সত্তরের দশকে এ নিয়ে বেশকিছু সমীক্ষা চালানোর পর এসব সংস্থা তাদের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক ধাঁচের গণশিক্ষা কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেয়। সত্তরের দশক থেকে অদ্যাবধি যে সব সংস্থা প্রথম বয়স্ক শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে আসে, তাদের মধ্যে রয়েছে ব্রাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, আরডিআরএস, বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি, ডিইআরসি প্রভৃতি। কেউ যদি মনে করেন আগে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল করে দেয়া হোক, তারপর সাক্ষরতার কথা ভাবা যাবে– এটা যেমন অবৈজ্ঞানিক, তেমনি আগে সব মানুষকে শিক্ষিত করে ফেল, তারপর তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা ভাবা যাবে, এটাও সমভাবে অবৈজ্ঞানিক। উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে সাময়িক কিছু চাকচক্য যে অর্জন করা যায় না তা নয়। কিন্তু সেটা হয় খুবই ক্ষণস্থায়ী। একটা যাত্রী বোঝাই রেলগাড়ি সমান এবং সমান্তরাল রেল লাইন ছাড়া চালানো সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি স্বনির্ভরতা এবং সাক্ষরতার কাজ সুপরিকল্পিতভাবে এক সঙ্গে চালু করতে না পারলে প্রকৃত উন্নয়নও সম্ভব নয়। এতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন গ্রাম সংগঠন এবং গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা। গ্রামবাসী এবং গ্রাম সংগঠনগুলোকে যদি সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে কাজে নামানো যায় তাহলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী এবং সুনিশ্চিত।

সরকারি পরসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬ কোটিরও বেশি লোক হচ্ছে বয়স্ক (অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সের অধিক)। আবার তার মধ্যে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ নিরক্ষর। (মেয়েদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি) বর্তমানে সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার খুবই করুণ যা সর্বদা দৈনিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। স্কুলে ভর্তির হার দেখানো হয় বেশি। তারপর শিক্ষার্থীদের আদৌ ধরে রাখতে পারছে না, শিক্ষার মান আশাতীত নিচু। শিক্ষকগণ বেশিরভাগ অনভিজ্ঞ এবং প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। ১৯৮৮ সালে প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল ৩৩.৮ লাখ, তার মধ্যে ১৯৯৩ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে টিকে থাকে মাত্র ১৭.৪ লাখ। সরকার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০০০ সাল নাগাদ "ঝরে পড়ার হার ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে, যা কোনমতেই ভরসা করা যায় না। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া কোন গতি নেই। ১৯৯৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সরকার এটা অবশ্য মেনে নিয়েছেন। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে ভাবতে হবে। আসলে শিক্ষার আয়োজনকে দেখতে হবে একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে। তার মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হবে সমান মর্যাদার এবং যথাযথ মানসম্পন্ন দু'টি উপব্যবস্থা।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিগত ১৯৮৪ সাল থেকে সরকারি নিয়ম নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অদ্যাবধি ১৩৮টি থানায় সরকারি কারিকুলাম, বই, প্রশিক্ষণ, অনুসরণ করে সফলতার সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে, যা সরকারি এবং বিশ্ব ব্যাংকের মূল্যায়নে প্রশংসিত এবং সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছে– যা ১৯৯৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে লেখা আছে।

কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান স্তরে থাকলে একজন দিনমজুর, জেলে, কামার, কুমার কিম্বা অনুরূপ শ্রমজীবী মানুষ তার অমানুষিক জীবন সংগ্রামের পরিবেশ থেকেও লেখা পড়ার চর্চাটা চালিয়ে যাবেই এ নিশ্চয়তা কেউ কি দিতে পারেন?

(লেখক– পরিচালক, শিক্ষা কর্মসূচী স্বনির্ভর বাংলাদেশ)